বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৪ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৩

বাংলাদেশে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধার প্রাক্কলন: ন্যাশনাল ট্রান্সফার একাউন্টের প্রয়োগ

বজলুল হক খন্দকার*
মুহাম্মদ মশিউর রহমান**

১। ভূমিকা

সাম্প্রতিককালে দেশের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে নীতিনির্ধারকরা অনুকূল বয়স কাঠামোর উপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করছেন। দেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধা (demographic dividend) সহ শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির সুযোগ বাংলাদেশকে শ্রম দক্ষতার উপর জোর দিয়ে এসব উপাদানকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে লাগানোর অনেক বড় সুযোগ এনে দিয়েছে। বাংলাদেশে সাধারণত শ্রমের গড় উৎপাদনশীলতা কম হয়ে থাকে। দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্তিকরণে বাংলাদেশকে প্রচুর সুবিধা প্রদান করবে। একইভাবে শ্রম শক্তিতে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ শ্রম সরবরাহ সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবে। অধিকন্তু কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক উদ্যোগ প্রয়োজন। এ বিষয়টির প্রতি যথাযথ নজর না দেয়ায় তা সরকারি বিনিয়োগের বাইরে থেকে গেছে। ব্যক্তি খাতের পৃষ্ঠপোষকতায় পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকা দরকার (সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল:২০১৬-২০,পৃ: ৪৭)। অধিকন্তু সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, নির্ভরতা হার কমায় ১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধা লাভের দরজা খুলে গেছে। তবে এ সুযোগের দরজা কত সময় পর্যন্ত খোলা থাকবে তা পর্যবেক্ষণমূলক তথ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয়নি। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধা লাভের সময় ও পরিসর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণের অপর্যাপ্ততা একটি শূন্যস্থান তৈরি করেছে। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধা থেকে অর্থনৈতিক সুফল লাভের নিমিত্তে মানব সম্পদ ও পুঁজি বিনিয়োগের চাহিদা ও প্রয়োজন নিরূপণের ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকদের এ শূন্যস্থানটির প্রতি অবশ্যই নজর দিতে হবে। এ প্রবন্ধে ন্যাশনাল ট্রান্সফার একাউন্ট (এনটিএ) পদ্ধতি ব্যবহার করে এ গ্যাপ পূরণের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে, যা বাংলাদেশে যেন জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধা নিরূপণ বা মূল্যায়নের উদ্যোগ নেয়া হয় তা নির্দেশ করে।

এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধার প্রথম পর্যায় মূল্যায়ন করা। প্রবন্ধটি মোট ৮টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম অনুচ্ছেদে ভূমিকার পর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে প্রাসঙ্গিক সমীক্ষা

---

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।।
** সিনিয়র রিসার্চ এসোসিয়েট, সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম), ঢাকা, বাংলাদেশ।

বা রচনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামোর সহায়তায় জনসংখ্যাতাত্ত্বিক পরিবর্তন বা রূপান্তর (demographic transition) আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ছাড়াও কর্মসংস্থান বা কর্মনিয়োজন কাঠামোর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। পরবর্তী দুটো অনুচ্ছেদে (পঞ্চম ও ষষ্ঠ) যথাক্রমে গবেষণা পদ্ধতি এবং উপাত্ত ও কতিপয় বিষয়ের সংজ্ঞা আলোচনা করা হয়েছে । বাংলাদেশ এনটিএ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল (যেমন অর্থনৈতিক জীবনচক্র ও জীবনচক্র ঘাটতি প্রাক্কলনের (estimation) পাশাপাশি ইকোনমিক সাপোর্ট রেশিও ও জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধার প্রথম পর্যায়ের প্রাক্কলন) আলোচনা করা হয়েছে প্রবন্ধের সপ্তম অনুচ্ছেদে। শেষ অনুচ্ছেদে উপসংহারীয় মন্তব্য স্থান পেয়েছে।

২। প্রাসঙ্গিক সমীক্ষাসমূহের পর্যালোচনা

জনমিতিক ধরন (demographic pattern) ও অর্থনীতির উপর তাদের প্রভাব বিষয়ক প্রচুর গবেষনামূলক রচনা লক্ষ করা যায়। তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর অনুপাতের মধ্যেকার সম্পর্ক বা যোগসূত্র (connection) বিষয়ে রচনা খুবই নগণ্য। ব্লুম, ক্যানিং ও ম্যালানি (২০০০) এবং ম্যাসন (২০০১) বলেছেন, পূর্ব এশিয়ার উচ্চমাত্রার ও ঈর্ষণীয় অর্থনৈতিক সাফল্য বহুলাংশে উক্ত অঞ্চলের বয়স কাঠামোর সাথে সংশ্লিষ্ট। ব্লুম, ক্যানিং ও ম্যাসনের সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত সমীক্ষাসমূহে মাথাপিছু আয়ের দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি নিরূপণ ও মূল্যায়নে মোট জনসংখ্যা-কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর অনুপাত, শ্রম উৎপাদনশীলতা,মানব পুঁজি, সঞ্চয় হার, বাণিজ্য নীতি সহ অন্যান্য চলক ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকন্তু উচ্চমাত্রার অর্থনৈতিক সাফল্য ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর অনুপাতের মধ্যেকার সংশ্লিষ্টতা বয়স কাঠামোর পরিবর্তনকে অন্তর্ভুক্ত (capture) করে। এসব গবেষণা ফলাফল হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর জনমিতিক পরিবর্তনের ধনাত্মক প্রভাব বিষয়ে পর্যবেক্ষণমূলক তথ্য-প্রমাণ (evidence) ।

ব্লুম ও ক্যানিং (২০০৪) ক্রস কান্ট্রি প্যানেল ডাটা (১৯৬৫-১৯৯৫) ব্যবহার করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী বৃদ্ধির হারের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ ধনাত্মক সম্পর্ক দেখিয়েছেন। অধিকন্তু তারা ধারণা করেন যে, জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধার সম্ভাবনা সেসব দেশে স্বীকৃত যেসব দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা অগ্রগতির একটা ক্ষেত্র প্রদান করে। ম্যাসন (২০০৬) প্রস্তাব করেন যে, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলভুক্ত প্রতিটি দেশকে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধার প্রথম পর্যায় থেকে সুফল লাভের নিমিত্তে কাজ করা প্রয়োজন।

একইভাবে অন্যান্য সমীক্ষায় (ফ্রাই ও ম্যাসন ১৯৮২, হিগিনস ১৯৯৮, কেলি ও স্কিমিডট ১৯৯৬) জনমিতিক কাঠামো ও প্রধান অর্থনৈতিক চলকসমূহের জাতীয় সামগ্রিক (aggregate) হার (যেমন সঞ্চয়, উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা) এর মধ্যে ইতিবাচক সংশ্লেষ বা সম্বন্ধ দেখতে পেয়েছেন। পারসন (২০০২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে জনমিতিক কাঠামো এবং উৎপাদন (output) ও উৎপাদনশীলতার মধ্যে ইতিবাচক সংশ্লেষ বা সম্পর্ক দেখতে পেয়েছেন। ব্লুম, ক্যানিং ও সেভিলা (২০০২) এর মতে,

আফ্রিকার মডারেটলি দুর্বল অর্থনৈতিক পারফরমেন্স এর সাথে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক পরিবর্তন থেকে উৎসারিত রাইটেয়াস সার্কেলের অনুপস্থিতির সংযোগ থাকতে পারে।

রাজন ও সুব্রামেনিয়াম (২০০৮) কে অনুসরণ করে গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট (২০১৫) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সঞ্চয়ের উপর কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর হারের পরিবর্তনের মধ্যে কারণিক (causal) সম্পর্ক নিরূপণে জেনারেলাইজড মেথড অব মোমেন্টস (জিএমএম) প্রাক্কলন বা হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করেন, যা ১৯৫০-২০১০ সময়কালের জন্য ১২৭টি দেশের ১,৭৯৬টি পর্যবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করে। বিভিন্ন স্পেশিফিকেশনের আওতায় করা ফলাফল থেকে দেখা গেছে, মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও সঞ্চয়ের উপর কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর হার বৃদ্ধির ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে । আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে, কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর হার এক শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেলে মাথাপিছু জিডিপি ১.১ থেকে ২ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পাবে বলে হিসাব করা হয়েছে। এ হিসাব থেকে আরও দেখা গেছে, কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর হার ১ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধির সাথে সঞ্চয়ের হার ০.৬ থেকে ০.৮ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পাওয়ার যোগসূত্র রয়েছে।

৩। বাংলাদেশের জনমিতিক পরিবর্তন

জনমিতিক পরিবর্তন বলতে উচ্চ প্রজনন ও উচ্চ মৃত্যু হারের সাম্যাবস্থা থেকে নিম্ন প্রজনন ও নিম্ন মৃত্যুহারের দিকে গমনকে বোঝায়। জনমিতিক পরিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথমে মৃত্যু হার হ্রাস পায়, বিশেষ করে শিশু মৃত্যু হার (ব্লুম প্রমুখ ২০০০:২৫৮)। মৃত্যু হার হ্রাস পাওয়ায় জনসংখ্যার ইয়ং কোহর্টের বেঁচে থাকার উচ্চ সম্ভাবনা দেখা দেয়। এর ফলে প্রজনন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি সার্জ দেখা দেয়। নিম্ন মৃত্যু হারের কারণে শিশু নির্ভরতা হার বৃদ্ধি পায় এবং জনসংখ্যা নিম্নমুখী হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পায় এবং জনসংখ্যার গড় বয়স বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বৃহৎ কোহর্ট কর্মজগতে প্রবেশ করতে শুরু করায় মোট জনসংখ্যার তুলনায় কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শিশু নির্ভরতা হার হ্রাস পায়। জনমিতিক পরিবর্তনের শেষ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হলো বৃহৎ কোহর্ট অবসর নেয়ার বয়সে পৌঁছায় বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আকার বৃদ্ধি পায় এবং বয়স্ক লোকদের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়।

আদম শুমারী ২০১১ অনুসারে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৪৯.৮ মিলিয়ন যা ২০০১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ২৫.৪ মিলিয়ন বৃদ্ধি পায়। ২০৩০ সাল নাগাদ দেশের মোট জনসংখ্যা ১৮৫.১ মিলিয়নে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে আর তা হবে মূলত দুটো কারণে (১) জন্মকালে জীবন প্রত্যাশা (পুরুষ ও মহিলা উভয়ের) বৃদ্ধি (২০০5 ও ২০১০ সালের ৬৭.৮ ও ৬৯.১ বছর থেকে ২০২৫ ও ২০৩০ সালে যথাক্রমে ৭৪.৪ ও ৭৬.৬ বছর) এবং (২) মোট প্রজনন হার হ্রাস (২.২ থেকে কমে ১.৮৩)।

চিত্র ১-এ বাংলাদেশের জনমিতিক ও বয়স কাঠামোর পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। চিত্র থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বয়স কাঠামোর উপর জনমিতিক পরিবর্তনের প্রভাব লক্ষ করা যায় কারণ জনসংখ্যার হার ১৯৭০ সালের ৪৪.৭ শতাংশ থেকে কমে ২০১০ সালে ৩১.৭ শতাংশ হয়েছে এবং তা আরও কমে ২০৫০ সালে ১৭.৩ শতাংশে দাঁড়াবে। একইভাবে ২০ বছরের কম বয়সী জনসংখ্যার হার ১৯৭০ সালের ৫৪.৭ শতাংশ থেকে কমে ২০১০ সালে ৪২.২ শতাংশে এবং ২০৫০ সালে ২৩.৫ শতাংশে দাঁড়াবে। ২০ বছরের কম বয়সী জনসংখ্যার হার ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ার কারণ হলো কর্মক্ষম জনসংখ্যার হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া--১৯৭০ সালের ৪১.৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ সালে ৫৩.২ শতাংশে এবং ২০৫০ সালে ৬০.৩ শতাংশে দাঁড়াবে।

চিত্র ১: বাংলাদেশের জনমিতিক ও বয়স কাঠামোর পরিবর্তন

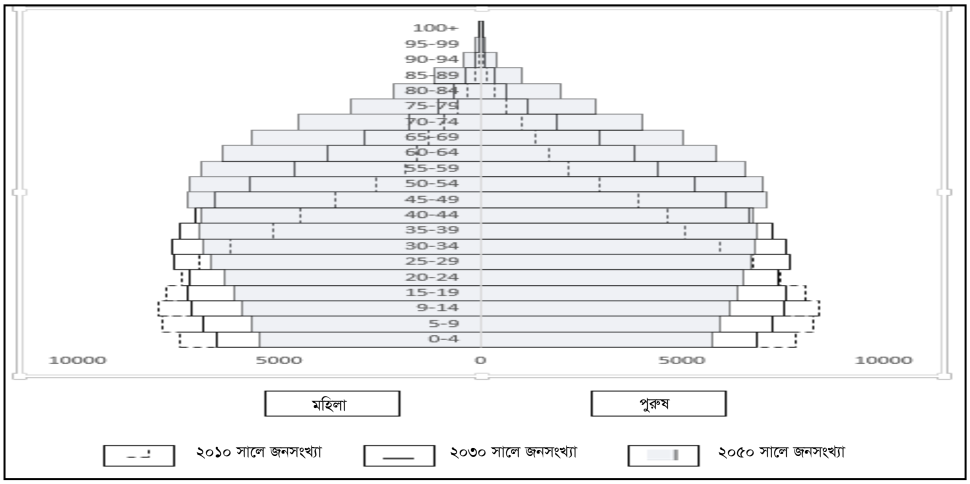

চিত্র ২ অনুসারে ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২ শতাংশের বেশি। এ সময়কালে প্রতি হাজারে জন্ম হার ছিল ৩৫ জনের উপরে এবং মৃত্যু হার ক্রমান্বয়ে কমেছে। পক্ষান্তরে ১৯৯০ দশকের শেষ দিক থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বার্ষিক এক্সপোনেন্সিয়াল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২ শতাংশের নিচে যখন জন্ম ও মৃত্যু হার উভয়টিই ক্রমান্বয়ে কমছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা ধীরগতির হ্রাস নির্দেশ করছে তথাপি ১৯৭০ ও ১৯৭৫ সালের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের আকস্মিক বৃহৎ পতন বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কার্লিন প্রমুখ (১৯৭৬) এর মতে এর কারণ হলো স্থূল মৃত্যু হারের লক্ষণীয় ওঠানামা এবং ১৯৭১ সালে যুগপৎ সংঘটিত স্বাধীনতা যুদ্ধ। বস্তুত প্রতি হাজারে মৃত্যুর হার দ্রুত উর্ধ্বগামী হয়ে ২১০ জনে পৌঁছে, ৫ বছরের গড় থেকে ৩৭ শতাংশ বেশি। ১৯৭২-৭৩ সালে নাগাদ একটা উল্লেখযোগ্য রিকভারী পরিলক্ষিত হয় (যেমন প্রতি হাজারে ১৬২ জন) যদিও এ হার স্বাভাবিক পর্যায়ের উপরে থাকে। পূর্ণ রিকভারী লক্ষ করা যায় স্বাধীনতার তিন বছর পর অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ সালে। ১৯৭৪-৭৫ সময়কালে (এ সময়

খাদ্যদ্রব্যের আকাশচুম্বী বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়) মৃত্যু হার বৃদ্ধি পায় ও প্রজনন হার কমে যায় (দেখুন চৌধূরী ও কার্লিন ১৯৭৮)। স্থূল মৃত্যু হার ও নবজাতক (infant) মৃত্যু হার ১৯৭৪ সালে দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৭৫ সালেও উচ্চে অবস্থান করে।

দেখা গেছে, বাংলাদেশের জনসংখ্যার বয়স কাঠামোতে অদূর ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটবে যার ফলে শিশু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কমবে এবং বয়স্ক ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

চিত্র ২: বাংলাদেশে স্থূল জন্ম হার, স্থূল মৃত্যু হার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

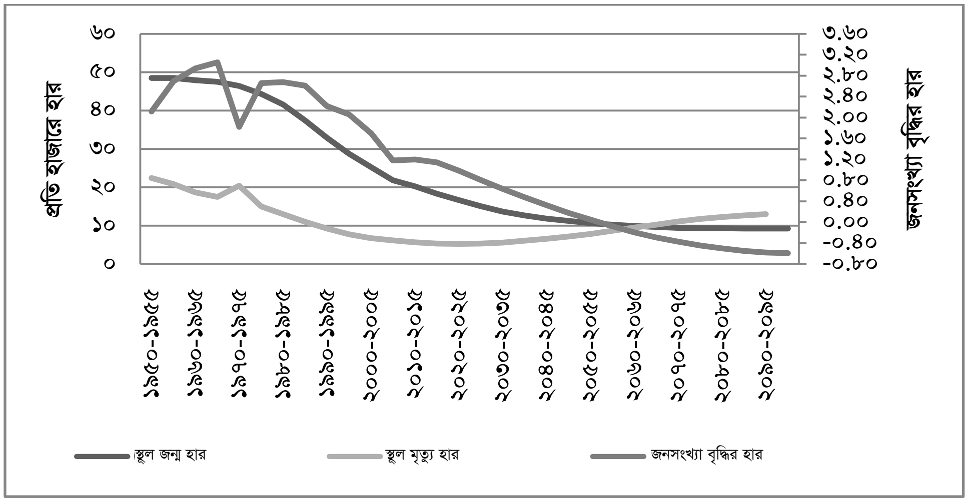

৪। অর্থনৈতিক কাঠামো, কর্মসংস্থান ও শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা সারণি ১–এ দেখানো হয়েছে। দেখা গেছে, ষাটের দশকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে বার্ষিক গড়ে প্রায় ৪ শতাংশ হারে। এ অর্থনীতির এক পঞ্চমাংশ ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালে ধ্বংস হয়ে যায়। এ ধকলের কারণে স্বাধীনতার পরবর্তী দুদশকে মন্থর গতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্মুখীন হয়। ১৯৯০ সাল থেকে অর্থনীতির গতি ত্বরান্বিত হয় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ১৯৯০ দশকের প্রথমার্ধে ৪ শতাংশের উপরে পৌঁছে। ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে প্রবৃদ্ধির হার ৫ শতাংশের উপরে পৌঁছে। গত দশকে প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ৬ শতাংশের কাছাকাছি অবস্থান করে।

খাতভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনীতির কাঠামো গত দুদশকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে (সারণি ১)। কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির হার গত দুদশকে নিম্ন থেকে মাঝারি পর্যায়ে থেকেছে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হয়েছে। গত দুদশকে সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি হার ৫-৬ শতাংশে স্থির রয়েছে।

সারণি ১: বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার

বছর	প্রধান খাত ভেদে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার (% বছর)			জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)
	কৃষি	ম্যানুফ্যাকচারিং	সেবা	
১৯৬০-৭০ (গড়)				৩.৯
১৯৭২-৯০ (গড়)				৩.৬
১৯৯০-৯৫(গড়)	*১.৫৫*	*৮.০৮*	*৪.৪৩*	*৪.১৫*
১৯৯৫-০০(গড়)	*৪.৮৮*	*৫.৫৯*	*৫.২৯*	*৫.২৩*
২০০০-০১	৩.১৪	৬.৮৭	৬.০০	৫.৪১
২০০১-০২	০.০১	৫.৪২	৫.৯৩	৪.৩৬
২০০২-০৩	৩.০৮	৬.৭৮	৫.৮৩	৫.৩৩
২০০৩-০৪	৪.০৯	৭.১৩	৬.১৩	৫.৮২
২০০৪-০৫	২.২১	৮.২০	৬.৭২	৫.৯৩
২০০৫-০৬	৪.৯৪	১০.৬৭	৬.৭২	৭.০২
২০০৬-০৭	৪.৫৬	৯.৬৩	৬.৮০	৬.৮৩
২০০৭-০৮	৩.২১	৭.৩২	৬.৩৮	৫.৮৮
২০০৮-০৯	৪.১২	৬.৮৮	৬.২২	৫.৯০
২০০৯-১০	৫.২৪	৬.৬৫	৬.৪২	৬.২২
২০১০-১১	৫.১৩	৯.১৪	৬.২৭	৬.৫৯
২০১১-১২	৩.১১	৯.২৬	৬.৩৭	৬.২৮
২০১২-১৩	২.১৭	৯.৪৫	৬.১৭	৬.০৬

উৎস: বিবিএস, বিশ্বব্যাংক হিসাব।

অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর উন্নয়নশীল দেশের স্টাইলাইজড পরিসংখ্যানের সাথে তাল রেখে হয়েছে (চিত্র ৩)। জিডিপিতে কৃষির অবদান ১৯৭২ সালের ৫০ শতাংশ থেকে কমে ২০১৪ সালে ১৬ শতাংশ হয়েছে এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির অবদান ৭৫ শতাংশ থেকে কমে ৪৫ শতাংশ হয়েছে। নিম্ন মাঝারি আয়ের দেশের (এলএমআইসি) গড়ের সাথে তুলনা করলে বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তরের ক্ষেত্রে দুটো বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। ১৯৮০ সাল থেকে বাংলাদেশে জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান বাড়ছে। ২০১৪ সালে জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান এলএমআইসিভুক্ত দেশগুলোর ১৫ শতাংশের বিপরীতে ২০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বৃহদাংশই সেবা খাতভুক্ত (বেশির ভাগই অপ্রাতিষ্ঠানিক)। ১৯৭২ সালে যেখানে সেবা খাতের অংশ ছিল ৪৫ শতাংশ, ২০১৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ শতাংশে উন্নীত হয়।

চিত্র ৩: বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর

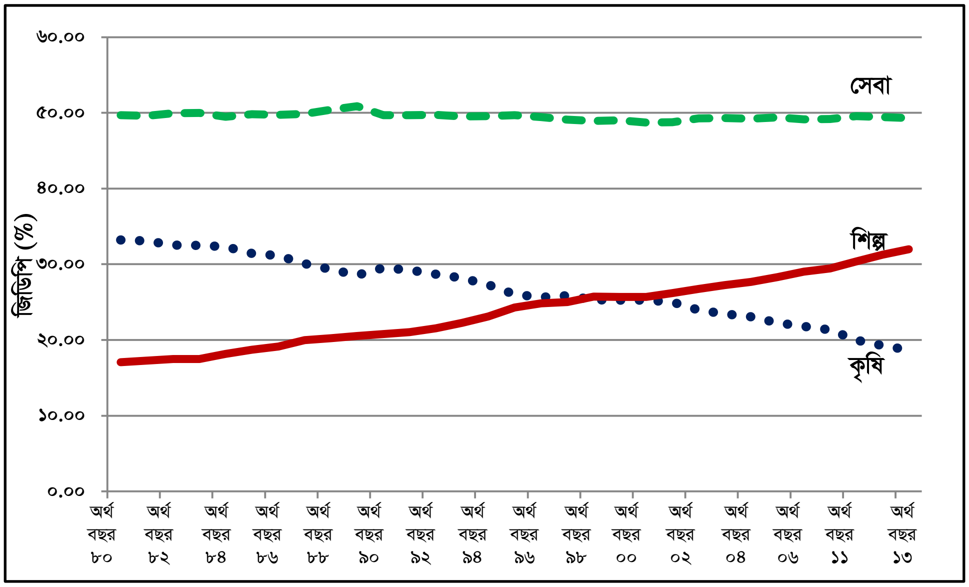

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

কাঠামোগত রূপান্তর কিছুটা হলেও কর্মসংস্থান কাঠামোকে প্রভাবিত করেছে। সারণি ২-এ বৃহৎ অর্থনৈতিক খাত ভিত্তিতে ১৫ বছর বয়সী কর্মনিয়োজিত লোকের শতকরা হার ৪ সময়কালের জন্য দেখানো হয়েছে (১৯৯৯-০০,২০০২-০৩, ২০০৫-০৬ ও ২০১০)। ১৯৯৯-০০ সালে কৃষিতে কর্মসংস্থানের হার ছিল ৫১.১ শতাংশ, যা সামান্য কমে ২০০২ সালে ৫২.২ শতাংশে দাঁড়ায়। তারপর থেকে কর্মসংস্থানে কৃষির অবদান ক্রমশ কমেছে। তা সত্ত্বেও ২০১০ সালে দেশের মোট কর্মসংস্থানে কৃষির অবদান ছিল ৪৭.৫ শতাংশ।

সারণি ২: বৃহৎ অর্থনৈতিক খাত ভেদে ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের শতকরা হার

বৃহৎ খাত	১৯৯৯-০০	২০০২-০৩	২০০৫-০৬	২০১০
কৃষি	৫১.০৬	৫২.১৫	৪৮.২১	৪৭.৫১
অকৃষি	৪৮.৯৪	৪৭.৮৫	৫১.৭৯	৫২.৪৯
ম্যানুফ্যাকচারিং	৯.৫৩	৯.৭৫	১০.৯৫	১২.৩৪
অন্যান্য শিল্প	৩.০৯	৩.৬৩	৩.৩৭	৪.৯৭
সেবা	৩৬.৩২	৩৪.৪৭	৩৭.৪৭	৩৫.১৭

উৎস: শ্রমশক্তি জরিপ ১৯৯৯-০০,২০০২-০৩, ২০০৫-০৬ ও ২০১০।

অকৃষি খাতে কৃষি খাতের বিপরীত প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। অকৃষি খাতে ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের নিয়োজনের হার ১৯৯৯ সালের ৪৮.৯ শতাংশ থেকে কমে ২০০২ সালে ৪৭.৯ শতাংশ হয়। ২০০২ সালের পর থেকে এ হার বাড়তে থাকে এবং ২০১০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫২.৫ শতাংশ

হয়। ম্যানুফ্যাকচারিং এর অবদান ১৯৯৯ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সব বছরেই বেড়েছে যেমন ১৯৯৯ সালের ৯.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২-০৩ সালে ৯.৮ শতাংশ, ২০০৫ সালে ১১ শতাংশ এবং ২০১০ সালে ১২.৩ শতাংশ হয়। কর্মসংস্থানে সেবা খাতের অবদানের ক্ষেত্রে উত্থান-পতন লক্ষ করা গেলেও ওঠানামার ব্যবধান ছিল সামান্য, যেমন ৩৫ থেকে ৩৭ শতাংশের মধ্যে। ১৯৯৯ সালে কর্মসংস্থানে সেবা খাতের অবদান ছিল ৩৬.৩ শতাংশ যা কমে ২০০২ সালে ৩৪.৫ শতাংশ এবং বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫ সালে ৩৭.৫ শতাংশ ও আবার কমে ২০১০ সালে ৩৫.২ শতাংশ হয়। কর্মসংস্থানে অন্যান্য শিল্প খাতের অংশ কম হলেও তা বাড়ছে। আরও সুনর্দিষ্ট করে বললে, কর্মসংস্থানে অন্যান্য শিল্পের অবদান ২০০০ সালের ৩.১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩ সালে ৩.৬ শতাংশ হয়, যা আরও কমে ২০০৫-০৬ সালে ৩.৪ শতাংশ এবং তা আবার বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ সালে ৫ শতাংশে পৌঁছে।

বাংলাদেশের শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ঠ্য হলো শ্রমশক্তিতে নারীর কম অংশগ্রহণ। চিত্র ৪-এ শ্রমশক্তিতে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ হারের ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রয়েছে তা দেখানো হয়েছে (৪ সময়কালে যথা ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬ ও ২০১০)। দেখা গেছে, শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ ১৯৯৬ সালের ৫২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ সালে ৫৯.৩ শতাংশ হয়েছে। এ সময়কালে শ্রমবাজারে নারী ও পুরুষ শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটা কাঠামোগত পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে, পুরুষ শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ ১৯৯৬ সালের ৮৭ শতাংশ থেকে কমে ২০১০ সালে ৮২.৫ শতাংশ হয়। অন্যদিকে নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে: নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ হার ১৯৯৬ সালের ১৫.৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ সালে ৩৬ শতাংশ হয়। অন্য কথায়, ২০০২ সাল থেকে পুরুষের অংশগ্রহণ হার কমেছে কিঞ্চিৎ হারে, ১ বা ২ শতাংশ পয়েন্ট হারে। ২০০৬-২০১০ সময়কালে তা আরও অধিক হারে কমেছে, ৪ শতাংশ পয়েন্ট হারে। অন্যদিকে নারীর অংশগ্রহণ হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা তুলনামূলকভাবে অধিক হারে।

চিত্র ৪: বাংলাদেশে শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ হার (%)

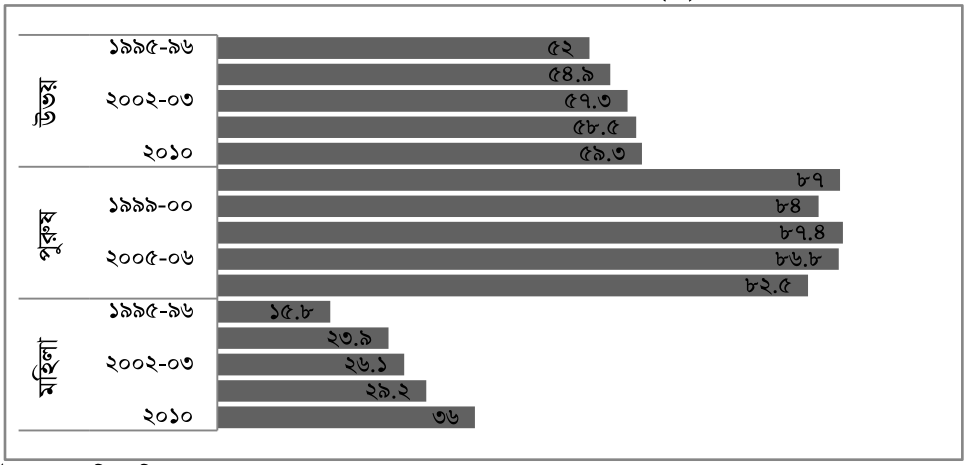

উৎস: শ্রমশক্তি জরিপ ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬ ও ২০১০।

চিত্র ৫-এ অর্থনৈতিক খাত ও লিঙ্গ ভিত্তিতে বাংলাদেশে শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ হার দেখানো হয়েছে। কৃষি খাতে পুরুষ শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ হার অধিক হারে অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৯৯-০০ সালের ৮১ শতাংশ থেকে কমে ২০১০ সালে ৫৯.৩ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ হার বাড়ছে, ১৯৯৯-০০ সালের ১৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ সালে ৪০ শতাংশ হয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ১৯৯৯ ও ২০০৩ সালের মধ্যে পুরুষ শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ হার প্রায় ৬০ শতাংশে স্থির ছিল। এর পর এটি বৃদ্ধি পেয়ে ৭৬ শতাংশ হয় ২০১০ সালে হ্রাসমান ধারায় যাওয়ার আগ পর্যন্ত। নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ধরন লক্ষ করা যায়নি। নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ হার কমে ২৪.৬ শতাংশে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ হার ছিল প্রায় ৩৮ শতাংশ এবং তারপর সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ শতাংশ হয়। সেবা খাতে নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ সবচেয়ে কম। নারীর অংশগ্রহণ হার ১২ থেকে ১৭ শতাংশের মধ্যে অবস্থান করছে। পুরুষ শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ হার সবসময় বেশি (৮৩ থেকে ৮৮ শতাংশের মধ্যে হয়ে থাকে)।

চিত্র ৫: অর্থনৈতিক খাত ও লিঙ্গ ভেদে বাংলাদেশে শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ হার (%)

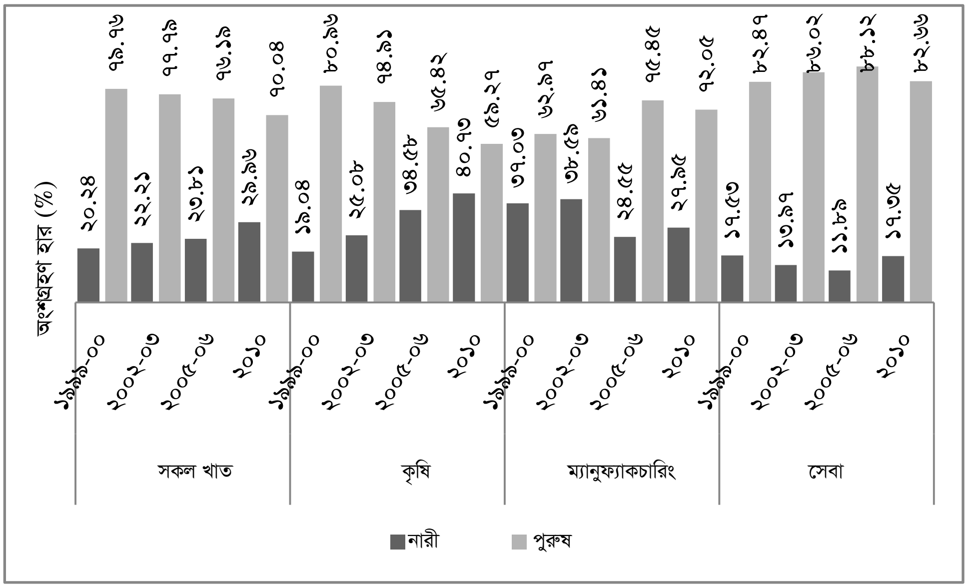

উৎস: শ্রমশক্তি জরিপ ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬ ও ২০১০।

চিত্র ৬-এ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস ভেদে কর্মসংস্থান হার দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশে ঐতিহ্যগতভাবে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান বা কর্মনিয়োজনের হার বেশি হয়ে থাকে। ২০০২ সাল থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে ৭৫ শতাংশের বেশি শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত ছিল। বাংলাদেশে ২০০৬ ও ২০১০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থানের ব্যাপক ইনফরমালাইজেশন বা অপ্রাতিষ্ঠানীকরণ হয়েছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান হার ২০০৬ সালের ৭৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ সালে প্রায় ৮৭ শতাংশে উন্নীত হয়।

চিত্র ৬: প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ভেদে ১৫ ও তদূর্ধ্ব বয়সী নিয়োজিত ব্যক্তিদের শতকরা হার (%)

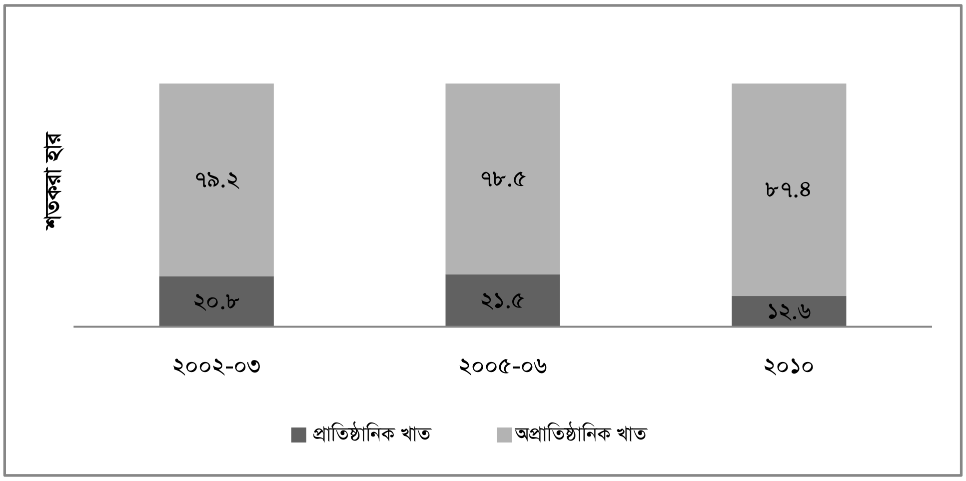

উৎস: শ্রমশক্তি জরিপ ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬ ও ২০১০।

চিত্র ৭-এ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত এবং লিঙ্গ ভিত্তিতে কতিপয় নির্বাচিত বছরের জন্য কর্মসংস্থান হার দেখানো হয়েছে। ২০০২-০৩ সালে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নারী ও পুরুষ কর্মসংস্থান হার একই রকম ছিল। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে পুরুষ কর্মসংস্থান হার ছিল ৭৮.৮ শতাংশ এবং নারী কর্মসংস্থান হার ছিল ৭৯.৮ শতাংশ। তারপর থেকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী কর্মসংস্থান হার বৃদ্ধি পেয়েছে--২০০২ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে প্রায় ৬ শতাংশ পয়েন্ট এবং ২০০২ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে প্রায় ১২ শতাংশ পয়েন্ট। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী কর্মসংস্থান হার কমেছে।

চিত্র ৭: খাত ও লিঙ্গ ভেদে ১৫ ও তদূর্ধ্ব বয়সী নিয়োজিত ব্যক্তিদের শতকরা হার

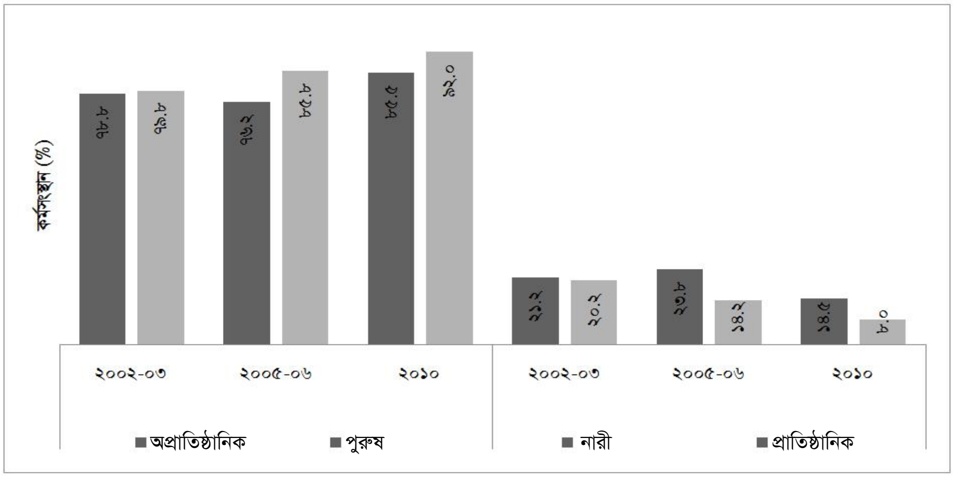

উৎস: শ্রমশক্তি জরিপ ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬ ও ২০১০।

৫। গবেষণা পদ্ধতি

৫.১। ন্যাশনাল ট্রান্সফার একাউন্ট ও জেনারেশনাল অর্থনীতি

ন্যাশনাল ট্রান্সফার একাউন্টস একটি দেশের অধিবাসীদের কাছে ও অধিবাসীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক প্রবাহের (economic flows) বিবরণ প্রদান করে। এ হিসাব ব্যাপকভিত্তিক হয়ে থাকে কেননা দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন থেকে জাত সকল ধরনের অর্থনৈতিক প্রবাহ হিসাবের অন্তর্ভুক্ত থাকে। মোট মূল্যমান জাতীয় হিসাবে প্রাপ্ত মূল্যমানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে। এনটিএ জেনারেশনাল অর্থনীতির উপর গুরুত্বারোপ সহ এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোকে তুলে ধরে: অর্থনৈতিক জীবনচক্র ও বয়স ইন্টারজেনারেশনাল ট্রান্সফার ও এসেটের উপর নির্ভর করে রিএলোকেশন অর্জন করা হয় ।

জীবনচক্র ঘাটতি হিসাব করার একটি বিশ্লেষণমূলক কাঠামো হলো এনটিএ। জীবনচক্র ঘাটতি হলো ভোগ ব্যয় থেকে শ্রম আয় বিয়োগ করে যা পাওয়া যায় তা। ব্যক্তিক প্রেক্ষিত থেকে একটা অর্থনীতিতে ভোগের অন্তর্ভুক্ত হলো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সামাজিক সহায়তা ও অন্যান্য দ্রবাদি, নগদ বা দ্রব্যে, ইত্যাদির জন্য গৃহীত লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান, খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত দ্রব্যাদির জন্য ব্যক্তিগত (পারিবারিক) ভোগ ব্যয়।

এনটিএ এর লক্ষ্য হলো জেনারেশনাল প্রেক্ষিত থেকে ইকোনমিক ফ্লোর পরিমাপের জন্য পদ্ধতিগত ও ব্যাপকভিত্তিক উপায়ের ব্যবস্থা করা। জেনারেশনাল অর্থনীতিকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:

জেনারেশনাল অর্থনীতি: (১) দ্রব্য উৎপাদন, ভোগ, শেয়ার ও সম্পদ সঞ্চয় করতে প্রতিটা প্রজন্ম বা বয়স গ্রুপ কর্তৃক ব্যবহৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক ম্যাকানিজম (২) প্রজন্ম বা বয়স গ্রুপে অর্থনৈতিক প্রবাহ, যা জেনারেশনাল অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য (৩) এক্সপ্লিসিট ও ইমপ্লিসিট কনট্রাক্টস যা আন্তজেনারেশনাল প্রবাহকে পরিচালনা করে, (৪) আয় ও ভোগের আন্তজেনারেশনাল বণ্টন (ম্যাসন ও লি ২০১১)।

৫.২। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডে এনটিএ

জনমিতিক পরিবর্তন দুটো উপায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে পারে: প্রথমত, নির্ভরতা অনুপাত হ্রাস পাওয়ায় এবং মোট জনসংখ্যার অনুপাতে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মক্ষম বয়স্ক লোক প্রতি নির্ভরশীল শিশুর গড় সংখ্যাও কমে যায়। ধারণা করা হয়, এতে অতিরিক্ত সংখ্যক শিশুদের জন্য ব্যয় কম হওয়ায় জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়। এটা হলো ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সার্বিক উন্নয়নকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের দ্বিতীয় পর্যায় দেখা দিতে পারে। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে, যখন প্রথম ডিভিডেন্ডের দ্রুত বৃদ্ধি (কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধি) স্বল্প মেয়াদে ব্যাপক সঞ্চয় এবং দীর্ঘমেয়াদে মানব পুঁজিতে উচ্চ বিনিয়োগ ও কর্মী পিছু বিনিয়োগকে ত্বরান্বিত করে তখন ডিভিডেন্ডের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়।

ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর প্রথম পর্যায় সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর বয়স কাঠামোর প্রভাব। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে, বয়স কাঠামো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর কিভাবে, কেন ও কতটুকু প্রভাব ফেলে। মোট নির্ভরতা অনুপাত হলো বয়স কাঠামোতে পরিবর্তনকে তুলে ধরার একটি কমপোজিট সূচক এবং এটা বয়স ভেদে আয়-উপার্জন ও ভোগের ভিন্নতা (variation) কে প্রতিফলিত করে না। এ সীমাবদ্ধতা অর্থনৈতিক জীবনচক্র এপ্রোচের উপর ভিত্তিশীল এনটিএতে দূর করা হয়েছে (ম্যাসন প্রমুখ ২০০৬)।

শ্রম উৎপাদনশীলতা ও সাপোর্ট রেশিও এর মধ্যে মাথাপিছু আয় ডিকম্পোজিশন এর মাধ্যমে বিশ্লেষণটি শুরু হয়েছে এভাবে:

$$\frac{Y}{N} = \frac{Y}{L} * \frac{L}{N}$$

Y আয়কে , L শ্রমশক্তিকে এবং N জনসংখ্যাকে বোঝাচ্ছে। সাপোর্ট রেশিও $\frac{L}{N}$ হলো নির্ভরতা রেশিও এর $\frac{N}{L}$ এর ইনভার্স। $\frac{L}{N}$ সূত্রটিকে কার্যকর (effective) ভোক্তার উপর কার্যকর উৎপাদকের সংখ্যা হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বৃদ্ধি অর্থে সমীকরণটি বর্ণনা করে যে:

$$gr\left(\frac{Y}{N}\right) = gr\left(\frac{Y}{L}\right) + gr\left(\frac{L}{N}\right)$$

উপরোক্ত সমীকরণটি নির্দেশ করে যে, মাথাপিছু আয়েরর প্রবৃদ্ধি হলো উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সাপোর্ট রেশিও বৃদ্ধির সমষ্টি বা যোগফল। এই সমীকরণ ব্যাখ্যা (construes) করে বয়স কাঠামো কেন সাপোর্ট রেশিও এর মাধ্যমে গ্রোথ বা প্রবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করতে পারে।

বয়স কাঠামো ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যেকার সংযোগ বা লিংক বিশ্লেষণ শুরু করার আরেকটা পয়েন্ট হলো মাথাপিছু ভোগ বা কনজামশন এর ডিকমপোজিশন: $\frac{C(t)}{N(t)} = c(t) * \frac{Y(t)}{L(t)} * \frac{L(t)}{N(t)}$; যেখানে $c(t) = \frac{C(t)}{Y(t)}$ হলো গড় ভোগ প্রবণতা বা ভোগ হার। প্রবৃদ্ধি অর্থে সমীকরণটি দাঁড়ায় এ রকম $gr\left(\frac{C(t)}{N(t)}\right) = gr\big(c(t)\big) + gr\left(\frac{Y(t)}{L(t)}\right) + gr\left(\frac{L(t)}{N(t)}\right)$ মানে মাথাপিছু ভোগ বৃদ্ধি হলো ভোগ বৃদ্ধির হার (সঞ্চয় হারের সাথে যুক্ত), উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সাপোর্ট রেশিও বৃদ্ধির সমষ্টি বা যোগফল।

ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের প্রথম পর্যায়কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বয়স কাঠামোর অবদান হিসেবে। সুনির্দিষ্ঠভাবে বললে, মাথাপিছু আয় বা মাথাপিছু ভোগে অবদান। এবং এটিকে পরিমাপ করা হয়েছে সাপোর্ট রেশিও এর বৃদ্ধি হিসেবে $gr\left(\frac{L(t)}{N(t)}\right)$. ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর প্রথম পর্যায় কর্মী প্রতি ভোগ হার ও আউটপুট হার স্থির রয়েছে ধরে ভোগের উপর বয়স কাঠামোর পরিবর্তনের প্রভাব পরিমাপ করে ।

সাপোর্ট রেশিও $\frac{L}{N}$ নির্ণয় করা হয়েছে ভোগ ও শ্রম আয়ের বয়স প্রোফাইল এর আকারকে স্থির ধরে এভাবে $\frac{L}{N}=\frac{\sum \gamma(a)*P(a,t)}{\sum \varphi(a)*P(a,t)}$ যেখানে γ হলো বয়স ভেদে উৎপাদনশীলতা এবং φ হলো বয়সভেদে ভোগ বা প্রয়োজন।

৬। সংজ্ঞা ও তথ্যের উৎস

বাংলাদেশের এনটিএ এর অন্তর্ভুক্ত তথ্যের উৎসসমূহ হলো: (১) বিবিএস খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১০, (২) বিবিএস শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০, (৩) জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) এর জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ সংক্রান্ত উপাত্ত, এবং (৪) বিবিএস প্রস্তুতকৃত জাতীয় হিসাব ব্যবস্থার উপাত্ত।

এনটিএ অনুসারে জীবনচক্র ঘাটতি (এলসিডি) হলো প্রতি বয়স গ্রুপে শ্রম আয়ের চেয়ে ভোগের আধিক্য অর্থাৎ আয়ের চেয়ে ভোগ বেশি হয়ে থাকে। বয়সভেদে এলসিডি এর আর্থিক মূল্য পেতে শ্রম আয় নিরূপণ করা অপরিহার্য। এ প্রবন্ধে শ্রম আয় হলো কর্মীদের মজুরি (নগদ ও দ্রব্যে) এবং মিশ্র আয়ের (নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয়) একটি নির্ধারিত অংশের সমষ্টি বা যোগফল। যেকোনো সমাজে শিশু ও বয়স্করা যা উৎপাদন করে তার চেয়ে বেশি ভোগ করে। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ভোগের চেয়ে শ্রম আয় বেশি হওয়ায় উদ্বৃত্ত থাকে। তবে নারীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছা যথার্থ নাও হতে পারে। বস্তুত এনটিএ হলো এমন এক ধরনের হিসাব ব্যবস্থা যা বয়সকে অন্তর্ভুক্ত করে যাতে শ্রম আয়, ভোগ ও জীবনচক্র ঘাটতির মূল্যায়ন বা নিরূপণ সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ব্যয় এবং শ্রম আয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি ব্যয়ের বয়স প্যাটার্ণ পেতে সরকারি ও বেসরকারি (খানা) ভেদে সদস্য ও ইউনিট পর্যায়ের উপাত্ত প্রয়োজন। এ ধরনের তথ্য সাধারণত খানা বাজেট জরিপে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১০ ব্যবহার করা হয়েছে। এ জরিপ অন্যান্য তথ্য সহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, খাদ্য, খাদ্য বহির্ভূত, ঘর ভাড়া, অর্থ ধার করা, গৃহ ঋণ,শিশু ভর্তির হার ইত্যাদি বিষয়ে ইউনিট পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। এ জরিপ শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ দ্বারা সাপ্লিমেন্টেড হয় যা আবার মজুরি ও বেতন এবং স্বকর্মসংস্থানভিত্তিক শ্রম আয় বিষয়ক মাঠ পর্যায়ের (micro level) তথ্যের প্রধান উৎস। ২০১০-১১ অর্থবছরের জন্য সরকারি ও বেসরকারি খানার স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ক ভোগের জন্য ম্যাক্রো এগ্রিগেট কন্ট্রোল সংকলন (compile) করা হয়েছে বিবিএস এর জাতীয় হিসাব ব্যবস্থার পরিসংখ্যান থেকে। শ্রম আয়ের জন্য ম্যাক্রো এগ্রিগেট কন্ট্রোল হলো কর্মীদের (অবশিষ্ট বিশ্বের কর্মীদের নেট কমপেনসেশন সহ) বেতন ও মজুরি (compensation) ও মিশ্র আয়ের দু-তৃতীয়াংশের সমষ্টি।

৭। বাংলাদেশ ন্যাশনাল ট্রান্সফার একাউন্ট থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

বাংলাদেশ এনটিএ ২০১০ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল দুটো প্রধান শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে : (১) জীবনচক্র ও জীবনচক্র ঘাটতি এবং (২) অর্থনৈতিক সাপোর্ট রেশিও ও ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর প্রথম পর্যায়।

৭.১। অর্থনৈতিক জীবনচক্র ও জীবনচক্র ঘাটতি

চিত্র ৮-এ বয়স ভেদে ভোগ চিত্র দেখানো হয়েছে। এটা হলো সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা ও অন্যান্য দ্রব্যের মাথাপিছু ভোগের সমন্বিত চিত্র। এ ভোগ চিত্র থেকে বয়স বৃদ্ধির পাশাপাশি ভোগের দ্রুত বৃদ্ধি, বিশেষ করে স্কুলগামীদের, পরিলক্ষিত হয় । চার বছর বয়স থেকে মাথাপিছু বার্ষিক ভোগ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ১৯ বছর বয়সে তা সর্বোচ্চ বিন্দুতে (early peak) পৌঁছে (যা শিক্ষায় বিনিয়োগকে নির্দেশ করে) এবং ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

চিত্র ৮ঃ মাথাপিছু ভোগ চিত্র, ২০১০

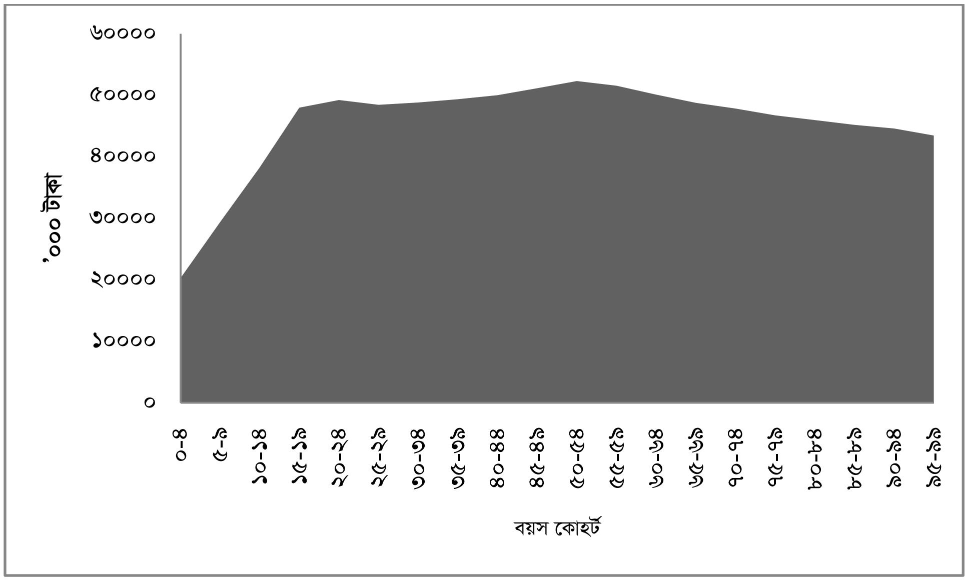

উৎসঃ লেখকদ্বয়ের হিসাব, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ট্রান্সফার একাউন্টস (২০১০)।

চিত্র ৯-এ বয়স ভেদে মাথাপিছু শ্রম আয়ের বণ্টন দেখানো হয়েছে। এ চিত্র থেকে কতকগুলো বিশেষ দিক পরিলক্ষিত হয়। এটা হলো একটা ইনভার্স ইউ আকৃতির কার্ভ যা কম বয়সে নিম্ন আয়ের সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে। প্রায় ৩৪ বছর পর্যন্ত শ্রম আয় ঊর্ধ্বমুখী বৃদ্ধি পায়, তারপর ৩৫ থেকে ৪৯ বছরের মধ্যে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। তারপর থেকে আয় কমতে শুরু করে এবং ৫৪ বছর থেকে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আয়ও দ্রুত হ্রাস পায়। অল্প বয়সে শ্রমশক্তিতে প্রবেশ এবং শ্রম আয়ে অল্প বয়সী

ব্যক্তিদের অবদান সামান্য হওয়ার কারণে শিশু শ্রমের উপস্থিতি সুস্পষ্ট। বয়স্কদের সরু হয়ে আসা (tapering) আয় চিত্র তাদের কম বা নিম্ন মজুরির নির্দেশক কারণ বয়স্কদের অনেকেই স্বনিয়োজিত কৃষক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত।

চিত্র ৯: মাথাপিছু শ্রম আয় চিত্র, ২০১০

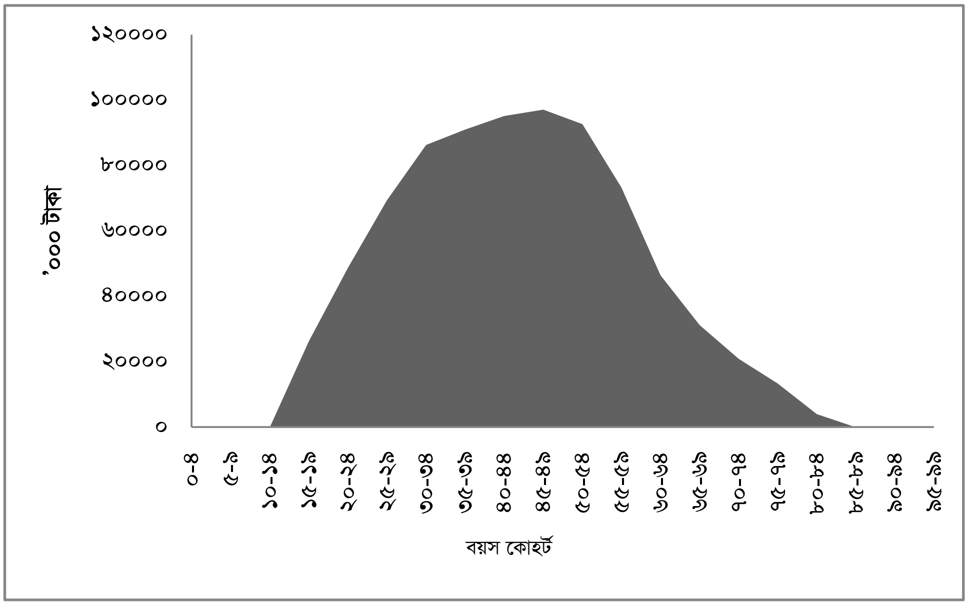

উৎস: লেখকদ্বয়ের হিসাব, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ট্রান্সফার একাউন্টস (২০১০)।

চিত্র ১০-এ প্রতি বয়স গ্রুপ ভেদে ঘাটতি দেখানো হয়েছে। এলসিডি এর বিবেচনায় তিনটি আলাদা বয়স গ্রুপ দেখতে পাওয়া গিয়েছে। দুটো ডেফিসিট গ্রুপ হলো শিশু (০-১৯ বছর) এবং বৃদ্ধ (৬৫ বছর ও তদূর্ধ্ব)। তবে শিশুদের চেয়ে বয়স্ক গ্রুপের ঘাটতি উচ্চতর হয়ে থাকে যা বয়স্ক লোক বিশিষ্ট[১] খানার তুলনায় শিশুবিশিষ্ট খানার আয়ের নিম্ন স্তর ও উচ্চ দারিদ্র্যকে নির্দেশ করে। বাংলাদেশে ২০ থেকে ৬৪ বছর বয়স্কদের নিয়ে গঠিত গ্রুপ উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করছে।

[১]খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১০ অনুসারে ০-১৮ বছর বয়সী শিশু বিশিষ্ট খানায় মাথা গণনা দারিদ্র্যের হার জাতীয় পর্যায়ের গড় হার ৩১.৫ শতাংশ থেকে ১.৭ শতাংশ পয়েন্ট বেশি। অন্যদিকে ষাটোর্ধ্ব বয়সী বয়স্ক বিশিষ্ট খানায় মাথা গণনা দারিদ্র্য হার জাতীয় পর্যায়ের গড় হার থেকে ৩.৩ শতাংশ পয়েন্ট বেশি (খন্দকার ২০১৪)।

চিত্র ১০: মাথাপিছু জীবনচক্র ঘাটতি চিত্র, ২০১০

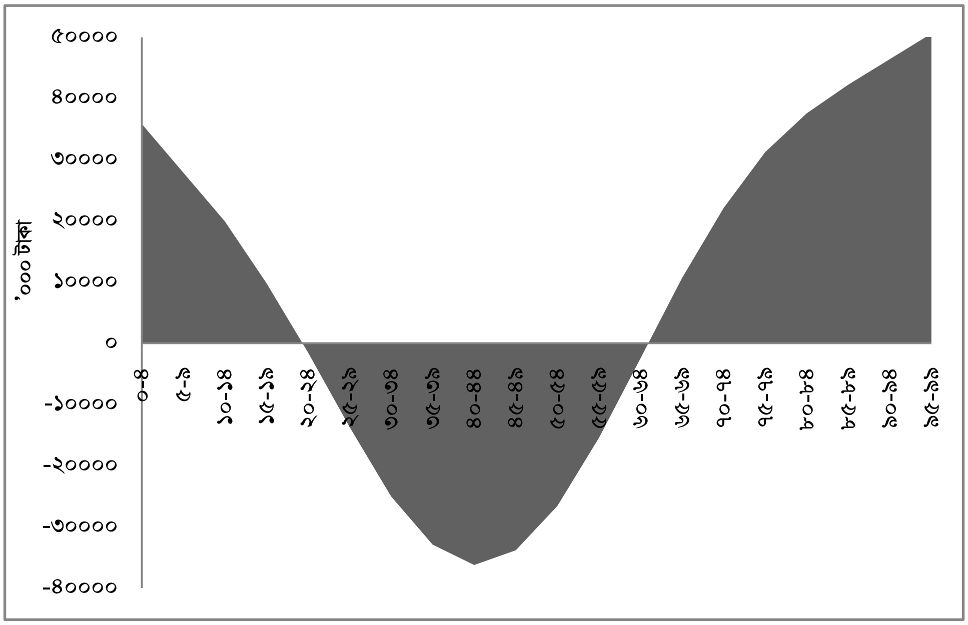

উৎস: লেখকদ্বয়ের হিসাব, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ট্রান্সফার একাউন্টস (২০১০)।

৭.২। অর্থনৈতিক সাপোর্ট রেশিও এবং জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধার প্রথম পর্যায়

আগেই বলা হয়েছে, প্রথম ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড ভোগ হার ও কর্মী প্রতি আউটপুটকে স্থির ধরে ভোগের উপর বয়স কাঠামোর পরিবর্তনের প্রভাব পরিমাপ করে । ইকোনমিক সাপোর্ট রেশিও এর ইতিবাচক বৃদ্ধি ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর প্রথম পর্যায় পরিমাপ করে যাকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বয়স কাঠামোর অবদান হিসেবে দেখা হয়, বিশেষ করে (এনটিএ প্রাক্কলন থেকে) মাথাপিছু আয় ও মাথাপিছু ভোগ।

২০০৬ এর রিভিশন অনুসারে জনসংখ্যা প্রক্ষেপণে জাতিসংঘ অনেকগুলো অনুমান (assumption) ব্যবহার করেছে। এ প্রবন্ধে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধার প্রথম পর্যায় পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে ফার্টিলিটি, মোর্টালিটি, কনসটান্ট ফার্টিলিটি ও মোর্টালিটি এর আওতায় আটটি ভেরিয়ান্টস ছাড়াও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংক্রান্ত অনুমানও ব্যবহার করা হয়েছে। এসব ভেরিয়ান্টস ব্যবহার করা হয়েছে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের প্রথম পর্যায়ের রেঞ্জের সাথে সর্বোচ্চ ইএসআর অর্জনের সম্ভাব্য বছরকে লক্ষ করতে। অধিকন্তু ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের প্রথম পর্যায়ের সুফল লাভে সর্বোচ্চ কত বছর অবশিষ্ট রয়েছে তা প্রাক্কলনেও ব্যবহার করা হয়েছে । ইএসআর এর সাথে সংশ্লিষ্ট ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর প্রথম পর্যায় আটটি জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ ভেরিয়ান্টস অনুসারে চিত্র **১১-১৩**-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র ১১-এ দেখা যাচ্ছে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের বিভিন্ন ভেরিয়ান্টস অনুসারে ইএসআর এর হারেও ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। বস্তুত উচ্চ ভেরিয়ান্ট জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে ইএসআর ইতিবাচকভাবে ২০৩০ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে মাঝারি ভেরিয়ান্ট জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে এটা ২০৩৫ সাল পর্যন্ত এবং নিম্ন ভেরিয়ান্টের সাথে ২০৪০ সাল পর্যন্ত ইতিবাচকভাবে বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তিনটি ভেরিয়ান্টস অনুসারে (উচ্চ, মাঝারি ও নিম্ন) বাংলাদেশে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর প্রথম পর্যায় ২০৩০, ২০৩৫ ও ২০৪০ সাল পর্যন্ত বজায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

চিত্র ১১: এনটিএ প্রোফাইলের ভিত্তিতে ইকোনমিক সাপোর্ট রেশিও, ২০১০

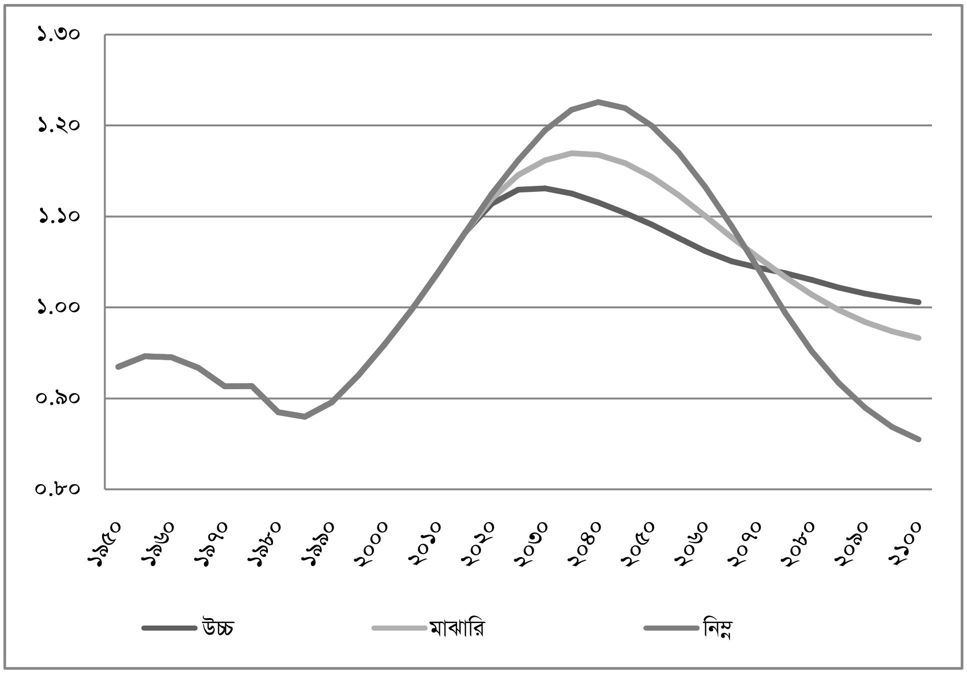

উৎস: লেখকদ্বয়ের হিসাব, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ট্রান্সফার একাউন্টস (২০১০)।

চিত্র-১২ এ কনসটান্ট ফার্টিলিটি, কনসটান্ট মোর্টালিটি ও ইনসটান্ট রিপ্লেসমেন্ট রেট সম্পর্কিত ইএসআর ভেরিয়েশনকে তুলে ধরা হয়েছে। দেখা গেছে, ইনসটান্ট রিপ্লেসমেন্ট রেট ও কনসটান্ট ফার্টিলিটি রেটের ক্ষেত্রে ইএসআর ২০৩০ সাল পর্যন্ত ইতিবাচকভাবে বৃদ্ধি পাবে। এর মানে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর প্রথম পর্যায় ২০৩০ সাল পর্যন্ত বজায় থাকবে। অন্যদিকে কনসটান্ট মোর্টালিটি রেটের ক্ষেত্রে ইএসআর ২০৪০ সাল পর্যন্ত ইতিবাচকভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর প্রথম পর্যায় ২০৪০ সাল পর্যন্ত বজায় থাকবে।

চিত্র ১২: এনটিএ প্রোফাইলের ভিত্তিতে ইকোনমিক সাপোর্ট রেশিও, ২০১০

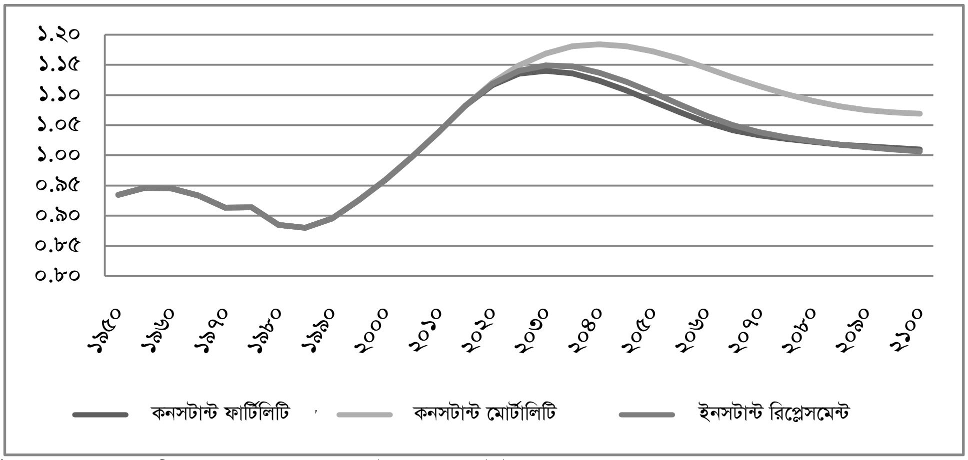

উৎস: লেখকদ্বয়ের হিসাব, বাংলাদেশ ন্যাসনাল ট্রান্সফার একাউন্টস (২০১০)।

আউট মাইগ্রেশনের ধরনও ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর প্রথম পর্যায়ের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। চিত্র ১৩-এ জিরো মাইগ্রেশনের অধীনে ইএসআর প্যাটার্ণ দেখানো হয়েছে। ফার্টিলিটি-মোর্টালিটিতে কোনো পরিবর্তন না হলে এটা ২০৩০ সাল পর্যন্ত ইতিবাচকভাবে বৃদ্ধি পাবে, যা নির্দেশ করে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর প্রথম পর্যায় ২০৩০ সাল পর্যন্ত বজায় থাকবে। মাইগ্রেশন রেট জিরো হলে ইএসআর ২০৪০ সাল পর্যন্ত ইতিবাচকভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর প্রথম পর্যায় ২০৪০ সাল পর্যন্ত বজায় থাকবে।

চিত্র ১৩: এনটিএ প্রোফাইলের ভিত্তিতে ইকোনমিক সাপোর্ট রেশিও, ২০১০

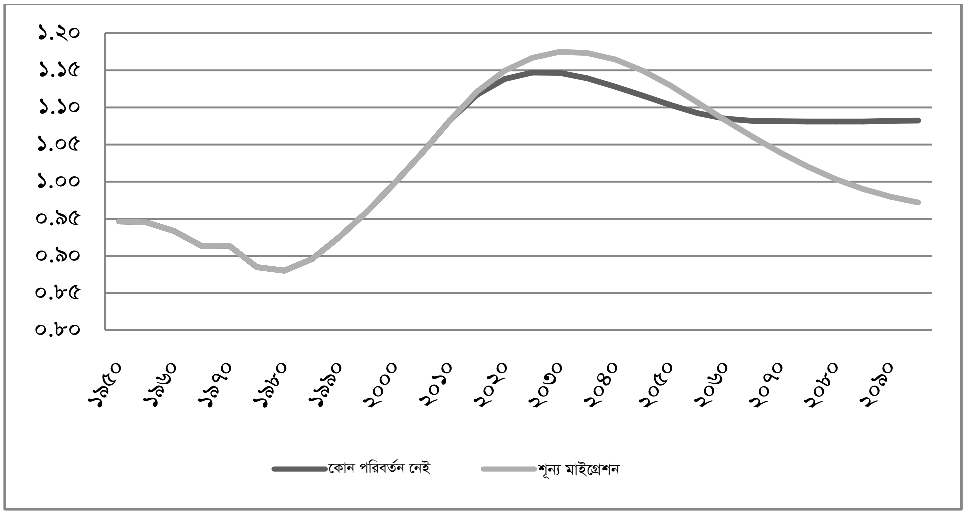

উৎস: লেখকদ্বয়ের হিসাব, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ট্রান্সফার একাউন্টস (২০১০)।

সারণি ৩-এ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ফার্টিলিটি-মোর্টালিটি হার এবং মাইগ্রেশন হার ইত্যাদি বিভিন্ন অনুমানের আওতায় ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর প্রথম পর্যায়ের প্রাক্কলন সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব প্রাক্কলন অনুসারে বলা যেতে পারে যে, বাংলাদেশে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর প্রথম পর্যায় ২০৩০ ও ২০৪০ সালের মধ্যে কোনো একটা পয়েন্ট পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এরপর এটি জনমিতিক অবস্থাতে আরও পরিবর্তন ঘটাবে।

সারণি ৩: বিভিন্ন জনসংখ্যা প্রক্ষেপণের আওতায় প্রাক্কলিত ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর প্রথম পর্যায়

বিভিন্ন অনুমানের আওতায় জনসংখ্যা	সর্বোচ্চ ইসআর অর্জনের বছর	ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের প্রথম পর্যায়ের বিস্তার	২০১৫ থেকে বাকি থাকা বছর
মোর্টালিটি অনুমান: convergence toward total fertility below replacement level			
উচ্চ ভেরিয়ান্ট	২০৩০	১৯৯০-২০৩০	১৫
মধ্য ভেরিয়ান্ট	২০৩৫	১৯৯০-২০৩৫	২০
নিম্ন ভেরিয়ান্ট	২০৪০	১৯৯০-২০৪০	২৫
কনসটান্ট ফার্টিলিটি	২০৩০	১৯৯০-২০৩০	১৫
ইনসটান্ট রিপ্লেসমেন্ট	২০৩০	১৯৯০-২০৩০	১৫
মোর্টালিটি অনুমান			
কনসটান্ট মোর্টালিটি	২০৪০	১৯৯০-২০৪০	২৫
কনসটান্ট ফার্টিলিটি ও মোর্টালিটি অনুমান			
কোনো পরিবর্তন নেই	২০৩৫	১৯৯০-২০৩৫	২০
আন্তর্জাতিক মাইগ্রেশন অনুমান			
শূন্য মাইগ্রেশন	২০৪০	১৯৯০-২০৪০	২৫

উৎস: বাংলাদেশ এনটিএ ২০১০ এর উপর ভিত্তি করে লেখকদ্বয়ের হিসাব।

গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০১৫ এ দেশীয় পর্যায়ে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডকে সহায়তা করার জন্য নীতি অগ্রাধিকারের একটি তালিকা প্রদান করা হয়েছে যা সারণি ৪-এ তুলে ধরা হলো।

সারণি ৪: জনমিতিক পরিবর্তন লেভারেজিং এর জন্য নীতি অগ্রাধিকারসমূহ

ধাপ বা পর্যায়	ইস্যুসমূহ	সুপারিশকৃত নীতি ও কৌশলসমূহ
১. ডিভিডেন্ড পূর্ব (Pre-dividend)	*জনমিতিক পরিবর্তন* প্রজনন হার কমাতে মানব উন্নয়ন পরিস্থিতির উন্নতি সাধন	মৌলিক স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা জোরদারকরণের মাধ্যমে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন. • মেয়ে শিক্ষার প্রসার ঘটানো • নারীদের ক্ষমতায়ন এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবায় নারীদের প্রবেশাধিকার দেয়া
২. ডিভিডেন্ড এর প্রথম পাদ (Early-dividend)	*কর্মসংস্থান সৃষ্টি ত্বরান্বিতকরণ* ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর প্রথম পর্যায় থেকে সুফল পেতে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধিষ্ণু অংশের জন্য উৎপাদনমুখী কাজের ব্যবস্থা করা	• কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণসহ মানব পুঁজিতে বিনিয়োগ করা • শ্রম বাজার গতিশীলতা বৃদ্ধি করা • নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করা • সঞ্চয় ও কর্ম সৃষ্টি সহায়ক পরিবেশের শক্তিশালীকরণ (যেমন কন্ট্রাক্ট এনফোর্সমেন্ট, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, শ্রম অধিকার সংরক্ষণ)

(চলমান সারণি ৪)

ধাপ বা পর্যায়	ইস্যুসমূহ	সুপারিশকৃত নীতি ও কৌশলসমূহ
৩.বিলম্ব ডিভিডেন্ড (Late-dividend)	*উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি টেকসই করা* ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর দ্বিতীয় পর্যায় থেকে সুফল পেতে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং বয়স্ক সমস্যা মোকাবেলায় প্রস্তুতি নেয়া	• উৎপাদনমূলক বিনিয়োগের জন্য সঞ্চয় আহরণ অব্যাহত রাখা • সরকারি নীতিসমূহ শ্রমশক্তিতে নারী ও পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করে তা নিশ্চিত করা • কল্যাণ ও মানব উন্নয়নের জন্য ব্যয় সাশ্রয়ী ও টেকসই ব্যবস্থা তৈরি করা যা চলতি প্রয়োজনের উপর (স্বাস্থ্য, শিশু যত্ন, শিক্ষা ও অসহায় ও দু:স্থ বয়স্কদের সহায়তা সহ) ফোকাস করে এবং এজিং এগিয়ে যাওয়ার সাথে দেখা দেয়া বা উদ্ভূত প্রয়োজন মেটাতে গ্রহণ করা যায়।
৪. ডিভিডেন্ড উত্তর (Post-dividend)	*এজিং সমস্যার সাথে ডিভিডেন্ড পরবর্তী অভিযোজন* কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হ্রাস ও বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও সেসব কার্যক্রম অব্যাহত রাখা	• কল্যাণমূলক ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ সংস্কার (পেনশন, স্বাস্থ্য সেবা এবং দীর্ঘমেয়াদি সেবা) যা ফিসকাল সাসটেইনেবিলিটিকে নিশ্চিত করার পাশাপাশি অসহায়, দু:স্থ, বয়স্ক ও অন্যদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং যারা সক্ষম তাদেরকে কাজ করতে উৎসাহ যোগায় • শ্রম শক্তির অংশগ্রহণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা (নারী ও জনগোষ্ঠীর বয়স্ক গ্রুপকে লক্ষ করে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের জন্য প্রণোদন প্রদান) • রিবাউন্ড অব ফার্টিলিটিকে উৎসাহিত করে এমন নীতি তৈরি করা এবং নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সন্তান লালনপালন ও শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ সহজ করা

উৎস: গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট (২০১৫) এর সারণি ৬.১ এর উপর ভিত্তি করে।

সারণি ৪-এ প্রদত্ত শ্রেণীকরণ এর বিপরীতে সারণি ৩-এ উল্লেখিত ইএসআর সম্পর্কিত প্রাক্কলন তুলনাকরণ থেকে দেখা যায় যে বাংলাদেশ বিলম্ব ডিভিডেন্ড এর দিকে ক্রমশ এগোচ্ছে। এজন্য জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধার প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য প্রাসঙ্গিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। তবে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের গৃহীত নীতিসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য যেমন পর্যাপ্ত বিনিয়োগ হয়নি (অর্থাৎ জিডিপির শতাংশ হিসেবে বিনিয়োগ এখনও প্রায় ৩-৪ শতাংশ ঘাটতি রয়েছে) তেমনি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সহ মানব সম্পদ উন্নয়নেও বিনিয়োগ অপর্যাপ্ত (বাংলাদেশে শিক্ষায় জিডিপির মাত্র ২ শতাংশ বিনিয়োগ হয় যা অন্যান্য দেশের বিনিয়োগের তুলনায় অনেক কম)। শ্রম শক্তিতে নারীর নিম্ন (২০১০ সালে পুরুষ ৮২ শতাংশের বিপরীতে নারীর ৩৬ শতাংশ) অংশগ্রহণ শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণে যে প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান রয়েছে তা নির্দেশ করে। অধিকন্তু সঞ্চয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির অনুকূল অবস্থা তৈরি ও তা জোরদারকরণে গৃহীত উদ্যোগও যথেষ্ট নয় কেননা জাতীয় সঞ্চয় হার ৩০ শতাংশের কাছাকাছি এবং বেকারত্বের হার ২০ শতাংশের বেশি। বাংলাদেশ যেহেতু সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারছে না সেহেতু জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধার প্রথম পর্যায় থেকে সুফল পেতে ব্যর্থও হতে পারে।

এ রকম একটা প্রেক্ষাপটে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে । আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে, এ পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে শ্রমবাজারে প্রবেশকারী নতুনদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্তে আগামী পাঁচ বছরে (২০১৬ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে) বিনিয়োগে জিডিপির হিস্যা বর্তমানের ২৮

শতাংশ থেকে আরও প্রায় ৩-৪ শতাংশ বৃদ্ধি করা। প্রাক্কলিত কর্মসংস্থান-উৎপাদন স্থিতিস্থাপকতা ০.৪৫ এর প্রেক্ষাপটে এরূপ উচ্চ মাত্রার বিনিয়োগ সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদকালে অতিরিক্ত ১৩ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থান হবে ।

সপ্তম পরিকল্পনায় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নে বর্ধিত বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে দেশে শিক্ষায় জিডিপির মাত্র প্রায় ২ শতাংশ ব্যয় করা হয়। সপ্তম পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে এ হার ০.৩ শতাংশ বৃদ্ধি করে ২০২০ সাল নাগাদ ২.৩ শতাংশে উন্নীত করা। এ লক্ষ্যমাত্রাকে সাধুবাদ জানানো গেলেও অন্যান্য দেশ শিক্ষায় যে পরিমাণ বিনিয়োগ করে সে তুলনায় এ পরিমাণ বিনিয়োগ অপর্যাপ্ত। যেমন ২০১১ সালে মালয়েশিয়ায় জিডিপির ৫.৯ শতাংশ শিক্ষায় বিনিয়োগ করা হয়। থাইল্যান্ড ও ভারতে এ হার যথাক্রমে ৫.৮ ও ৩.৯ শতাংশ। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপশি উৎপাদনশীলতামুখী প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সেবা প্রদান ব্যবস্থা বা সার্ভিস ডেলিভারীর গুণগতমান উন্নয়নের উপায়ও বের করা প্রয়োজন।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা গঠনমূলক কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং এজন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দও দিতে হবে। নানাবিধ প্রচেষ্টা নেয়া সত্ত্বেও প্রশিক্ষিত কর্মীর অপ্রতুলতার কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, শ্রমিকদের দক্ষতার স্তর নির্ধারণে আনুষ্ঠানিক টিভিইটি (TVET) প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে প্রদত্ত সার্টিফিকিট অন্যতম প্রধান মানদণ্ড নয়। বেশির ভাগ নিয়োগদাতা মনে করেন কর্মীরা যে প্রশিক্ষণ পায় তা কেবল অপর্যাপ্ত নয় অধিকন্তু তা নিয়োগদাতাদের প্রয়োজনের সাথে প্রাসঙ্গিক নয়। প্রশিক্ষিত কর্মীদের অর্ধেকের বেশি চাকরী পায় না। এসব হলো টিভইটি ব্যবস্থার ত্রুটি যা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিতেও উল্লেখিত হয়েছে। সপ্তম পরিকল্পনায় বলা হয়েছে অধিকাংশ বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো/ল্যাব/প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির যেমন ব্যাপক ঘাটত রয়েছে, তেমনি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অবকাঠামো ও জনবলের ঘাটতি রয়েছে। সপ্তম পরিকল্পনার দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত কৌশলের প্রধান উপাদানসমূহ হলো:

- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কৌশল (২০১১) এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা।
- ত্বরান্বিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা।
- আইসিটি খাতসহ বিকাশমান ক্ষেত্রসমূহে (যেমন মৎস্য উৎপাদন, চামড়া, টেক্সটাইল, মেকাট্রনিকস, খনি ও খনন জরিপ, ইন্সট্রুমেন্টেশন ও প্রসেস কন্ট্রোল, নির্মাণ, পরিবেশ, গার্মেন্ট ডিজাইন ও প্যাটার্ণ মেকিং, ইলেকট্রো মেডিক্যাল) কারিগরি জনশক্তির প্রয়োজন পূরণে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কর্মসূচিতে বৈচিত্র্য আনয়ন।
- ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অধিক সংখ্যায় নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা ।
- দারিদ্র্য দূরীকরণ ও গ্রাম থেকে শহরে অভিগমন রোধকল্পে গ্রাম পর্যায়ে দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পর্যাপ্ত টেকনোলজি সহ বিদ্যমান টিভিই প্রতিষ্ঠানসমূহ আধুনিকীকরণ করা।

- *কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনায় বেসরকারি ও ব্যক্তিখাতের সম্পৃক্ততা ও উদ্যোগ উৎসাহিত করা।* [২]

বর্ধিত নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের প্রতিও নজর দিতে হবে। নারীরা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হলেও দেশের শ্রম বাজারে তাদের অংশগ্রহণ খুবই কম, মাত্র ৩৬ শতাংশ অথচ শ্রম বাজারে পুরুষদের অংশগ্রহণ হার ৮০ শতাংশ। মধ্যমেয়াদি সময়কালে নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ হার যুক্তিসঙ্গত হারে বৃদ্ধি করতে হবে। সপ্তম পরিকল্পনায় নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হলেও এ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি সংক্রান্ত কৌশলসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়নি। প্রাসঙ্গিক কৌশলসমূহের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে:

- *গৃহস্থালীর সেবামূলক কাজ থেকে নারীদের মুক্তি দেয়া।* গবেষণায় দেখা গেছে, নারীরা গৃহস্থালী কাজে একটা উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় করে। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের সেবাযত্ন করে যা নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের গৃহস্থালী কাজের বোঝা লাঘবের জন্য সাপোর্ট সার্ভিসে বিনিয়োগ করা যেমন প্রয়োজন তেমনি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কেয়ার সার্ভিস বা সেবা-যত্ন প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। .
- *বাল্য বা শিশু বিবাহ বন্ধ করা।* গবেষণায় দেখা গেছে, শিশু বা বাল্য বিবাহ সহ সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন পিতৃতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য নারী ক্ষমতায়নে যেমন প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে তেমনি শ্রমবাজারে নারীর সম্পৃক্ততা ও শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণে বাধা স্বরূপ। এজন্য আইনপ্রণয়নকারী সংস্থা ও সরকার উভয়ের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- *নিরাপদ ও সহায়ক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।* নারী উদ্যোগ বা উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উদ্যোগ গ্রহণ ও সেসব কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহের বিশদ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, সমস্যা মোকাবেলা কৌশলের অংশ হিসেবে নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল যার জন্য আবার প্রয়োজন নারীদের জন্য নিরাপদ, নিশ্চিত ও সহজলভ্য কর্ম পরিবেশ বিশেষ করে নিরাপদ আবাসন ও পরিবহন/যাতায়াত সুবিধার ব্যবস্থা করা।

আরেকটা ইতিবাচক অগ্রগতি হলো জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) প্রণয়ন ও তার অনুমোদন। সপ্তম পরিকল্পনায় এনএসএসএস এর দ্রুত বাস্তবায়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যদিও বাংলাদেশ ডেমোগ্রোফিক ডিভিডেন্ড এর প্রথম পর্যায় থেকে সুফল পেতে সহায়ক নীতি/কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ধীর হলেও সম্প্রতি ব্যাপকভিকিত্তক জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা

---

[২]সপ্তম পরিকল্পনায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য কোনো বাজেট প্রাক্কলন পাওয়া না গেলেও মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য মোট প্রশিক্ষণ বাজেট ২০১৬ অর্থবছরের ০.১৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ অর্থবছরে ০.২৪ শতাংশ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ বাজেট তিনটি মন্ত্রণালয়কে বরাদ্দ দেয়া হবে: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

কৌশল তৈরি করা হয়েছে যা ডেমোগ্রোফিক ডিভিডেন্ডের শেষ দুটো পর্যায় (অর্থাৎ লেট বা পোস্ট ডিভিডেন্ড পিরিয়ড) এর উপযোগী। এনএসএসএস জীবনচক্র সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ (দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠী কর্তৃক সম্মুখীন হওয়া) চিহ্নিত করে সেসব ঝুঁকি হ্রাসের চেষ্টা করে সুষ্ঠু আয় হস্তান্তর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যা জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে দরিদ্র ও অসহায় অংশের কাছে পৌঁছে (শিশু, বিদ্যালয়গামী ছেলেমেয়ে, দু:স্থ ও অসহায় নারী, বয়স্ক ও শারীরিকভাবে অক্ষম জনগোষ্ঠী)। বস্তুত এনএসএসএস হচ্ছে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল যা ধর্ম, বর্ণ, পেশা, অবস্থান বা এথনিসিটি নির্বিশেষে সকল জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি কনট্রিবিউটরি সামাজিক বীমা ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিধিবিধান (শ্রমিকদের সুরক্ষা দিতে) অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন ও উন্নত করার চেষ্টা করে ।

৮। উপসংহার

এ প্রবন্ধে এনটিএ ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধার প্রথম পর্যায়ের ব্যাপ্তি ও পরিসর পরিমাপ করা হয়েছে। এই পরিমাপ আবার নির্ভর করে ইএসআর এর উপর। ইএসআর অর্থনৈতক জীবন চক্রকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের প্রথম পর্যায়ের পরিমাপক হিসেবে ট্রান্সলেট করে। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের প্রথম পর্যায়ের বিশুদ্ধ পরিমাপক হিসেবে মোট নির্ভরতা অনুপাত এর পরিবর্তে ইএসআর প্রতিস্থাপিত হয় । প্রাক্কলন থেকে দেখা যায়, জনসংখ্যার বিভিন্ন প্রক্ষেপণ অনুসারে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধার প্রথম পর্যায় ২০২০ থেকে ২০৪৫ সাল পর্যন্ত বজায় থাকবে।

ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড ও আয় প্রবৃদ্ধির মধ্যেকার সম্পর্ক ও সংযোগ পলিসি নির্ভর। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধার প্রথম পর্যায় অংশত কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফল। এবং এটা বাস্তবরূপ পায় যদি কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সাথে তাল রেখে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। সম্ভাব্য জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধার প্রথম পর্যায়ের সুফল ভোগ করতে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়টি সপ্তম পরিকল্পনায় গুরুত্ব পেয়েছে। অধিকন্তু সপ্তম পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে (যেমন ২০১৬ সাল থেকে ২০২০ সালের মধ্যে গড় ৭.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা) জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধার প্রথম পর্যায়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

এ প্রবন্ধে সুপারিশকৃত নীতি ও কৌশলসমূহে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উচ্চমাত্রার বিনিয়োগের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এছাড়া শিক্ষায় উচ্চমাত্রার সরকারি খাতের বিনিয়োগ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারী অংশগ্রহণের ওপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধা থেকে সবোর্চ্চ সুফল পেতে জিওফ্রে ও গেভিন (২০১৫) তাঁদের এক সমীক্ষায় একই ধরনের কৌশল চিহ্নিত করেছেন। এ কৌশলগুলো হলো: (১) শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি (বিদ্যালয়গামী শিশুদের সংখ্যা লেভেলিং অফ এর কারণে); (২) মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ব্যাপক বিনিয়োগ; (৩) মজুরিভিত্তিক ও স্ব-কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি সহ নারী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি সাধন। তারা এ উপসংহার টানেন যে ”শ্রমশক্তিতে নারীর ব্যাপক সম্পৃক্তকরণ, যা কিছুটা পরিবারসমূহের টিকে বা বেঁচে থাকার প্রয়োজনকে তুলে ধরে, জেন্ডার নর্মে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনসমূহকেও রিফ্লেক্ট করে।”

গ্রন্থপঞ্জি

BBS (Bangladesh Bureau of Statistics) (2010): *Labour Force Survey 2010*. Accessed 08 01, 2015. http://www.bbs.gov.bd/PageWebMenuContent.aspx?MenuKey=235.

Bloom, D. and D. Canning (2004): "Global Demographic Change: Dimensions and Economic Significance," NBER Working Paper 10817, NBER.

Bloom, D., D.Canning and P. Malaney (2000): "Demographic Change and Economic Growth in Asia," Population and Development Review, Vol. 26.

Bloom, D., D.Canning and J. Sevilla (2002): *The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change*, Santa Monica, California RAND, MR–1274.

Chowdhury, A.K.M. Alauddin, and Georgr T. Curlin (1978): "Recent Trends in Fertility and Mortality in Rural Bangladesh 1966-1975," ICDDR,B Working Paper No. 03, Dacca: Cholera Research Laboratory:Dacca.

Curlin, George T., Lincoln C. Chen and Sayed Babur Hussain (1976): "Demographic Crisis: The Impact of the Bangladesh Civil War (1971) on Births and Deaths in a Rural Area of Bangladesh," *Population Studies: A Journal of Demography*, Volume 30, Issue 1.

Fry, M. and A. Mason (1982): "The Variable Rate of Growth Effect in the Life-Cycle Model," *Economic Enquiry*, Vol. 20.

Geoffrey, H. and J. Gavin (2015): "The Impact of the Demographic Transition on Socioeconomic Development in Bangladesh: Future Prospects and Implications for Public Policy," 7th Five Year Plan (Background Study). 01 18. Accessed 08 01, 2015. http://www.plancomm.gov.bd/wp-content/uploads/2015/02/22_Impact-of-Demographic-Transition-on-Socioeconomic-Development.pdf.

Higgins, M. (1998): "Demography, National Savings, and International Capital Flows," *International Economic Review*, Vol. 39.

Kelley, A. and R.Schmidt (1996): "Saving, Dependency, and Development," *Journal of Population Economics*, Vol. 9.

Khondker, B. H. (2014): "Poverty, Vulnerability and Inequality in Bangladesh," Paper 01, NSPS Background Paper Series, Ministry of Planning, Government of Bangladesh.

Mason, A. (2006): "Population Ageing and Demographic Dividends: The Time to Act is Now," *Asia–Pacific Population Journal*, 21(3):7–16.

Mason, A. and R. Lee (2011): "Population Aging and the Generational Economy: Key Findings," in R. Lee and A. Mason (eds.) *Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspective*, Edward Elgar, IDRC.

Person, J. (2002): *Demographics, Human Capital and Economic Growth: A Study of US States 1930-2000*, FIEF Working Paper.

Rajan, R. G. and A. Subramanian (2008): "Aid and Growth: What Does the Cross-Country Evidence Really Show?" *Review of Economics and Statistics*, 90 (4): 643–65.

World Bank Group. 2016. *Global Monitoring Report 2015/2016: Development Goals in an Era of Demographic Change*,Washington, DC: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-0669-8. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.